بسم اللہ الرحمن الرحیم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২১ আগস্ট, ২০২০ মোতাবেক ২১ যহুর, ১৩৯৯ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

বদরী সাহাবীদের স্মৃতিচারণের ধারাবাহিকতায় আজ যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ করা হবে তার নাম হলো হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম (রা.)। হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম-এর পিতার নাম ছিল আওয়াম বিন খুআয়লেদ আর মাতার নাম ছিল সফিয়া বিনতে আব্দুল মুত্তালেব, যিনি মহানবী (সা.)-এর ফুফু ছিলেন। হযরত যুবায়ের (রা.)-এর বংশক্রম কুসাই বিন কিলাব পর্যন্ত গিয়ে মহানবী (সা.)-এর সাথে মিলিত হয়। তিনি রসূল (সা.)-এর পবিত্র স্ত্রী হযরত খাদিজা (রা.)-এর ভাতিজা ছিলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর কন্যা হযরত আসমা (রা.)-এর সাথে হযরত যুবায়ের (রা.)-এর বিয়ে হয়েছিল। অপরদিকে মহানবী (সা.)-এর বিয়ে হয়েছিল হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর (আরেক) কন্যা আয়েশা (রা.)-এর সাথে। এভাবে হযরত যুবায়ের (রা.) মহানবী (সা.)-এর ভায়রাও ছিলেন। এ ছিল মহানবী (সা.)-এর সাথে হযরত যুবায়ের (রা.)-এর আত্মীয়তার সম্পর্ক। তার ডাকনাম ছিল আব্দুল্লাহ্। তার মাতা হযরত সফিয়া (রা.) নিজের ভাই যুবায়ের বিন আব্দুল মুত্তালেব-এর ডাকনাম অনুসারে তার ডাকনাম রেখেছিলেন আবু তাহের। কিন্তু হযরত যুবায়ের (রা.) নিজের ডাকনাম তার পুত্র আব্দুল্লাহ্র নামের সাথে মিলিয়ে রাখেন, যা পরবর্তীতে অধিক প্রসিদ্ধি পায়। হযরত যুবায়ের (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)-এর পর ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণকারীদের মাঝে তিনি ছিলেন চতুর্থ বা পঞ্চম ব্যক্তি। হযরত যুবায়ের (রা.) ১২ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন। কোন কোন রেওয়ায়েত অনুসারে তিনি ৮ কিংবা ১৬ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। হযরত যুবায়ের (রা.) সেই দশজন সৌভাগ্যবান সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাদেরকে মহানবী (সা.) তাদের জীবদ্দশায় জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। এছাড়াও তিনি সেই ছয়সদস্য বিশিষ্ট মজলিসে শূরার সদস্যের একজন যাদেরকে হযরত উমর (রা.) নিজ মৃত্যুর পূর্বে পরবর্তী খলীফা নির্বাচনের জন্য মনোনীত করেছিলেন। হযরত যুবায়ের (রা.)-এর পিতা আওয়ামের মৃত্যু বরণের পর নওফেল বিন খুআয়লেদ তার ভাতিজা যুবায়েরকে লালন-পালন করতেন। হযরত যুবায়ের (রা.)-এর মাতা হযরত সফিয়া (রা.) যুবায়ের (রা.)-এর শিশুকালে তাকে প্রহার বা বকাঝকা করতেন। তখন নওফেল অর্থাৎ তার চাচা হযরত সফিয়া (রা.)-কে বলেন, শিশুদেরকে কি এভাবে প্রহার করা হয় বা শাসন করা হয়! তুমি তো এমনভাবে প্রহার কর যেন তুমি তার প্রতি অসন্তুষ্ট। তখন হযরত সফিয়া এই পঙক্তিগুলো পাঠ করেন,

মান ক্বালা ইন্নি উবগিযুহু ফাক্বাদ কাযাব
ওয়া ইন্নামা আযরিবুহু লেকায় ইয়ালাব
ওয়া ইয়াহ্যেমাল জায়শা ওয়া ইয়া'তি বিস্ সালাব
ওয়া লা ইয়াকুন লেমালিহি খাবআ ওয়াখাব
ইয়াকুলু ফিল বায়তে মিন তামরে ওয়াহাব

অর্থাৎ যে ব্যক্তি এটি মনে করে যে, আমি তার প্রতি অসন্তুষ্ট, সে মিথ্যাবাদী। আমি তাকে এজন্য প্রহার করি যেন সে সাহসী হয় এবং সেনাবাহিনীকে পরাস্ত করতে পারে,

নিহতদের সম্পদ নিয়ে ফিরে আসে এবং নিজ সম্পদের জন্য যেন লুকিয়ে বসে না থাকে, অর্থাৎ ঘরে বসে বসে কেবল খেজুর ও খাবার খেতে থাকবে (এমন যেন না হয়)। যাহোক এ ছিল তার চিন্তাধারা আর এটিই তার তরবিয়ত বা প্রশিক্ষণের রীতি; সাহসী বানানোর এটিই পন্থা মাত্র। এটি আবশ্যক নয় যে, একে আমরা খুব ভালো পন্থা আখ্যা দিব। সাধারণত আজকাল এটিই দেখা যায় যে, এর ফলে আত্মবিশ্বাসের অভাব দেখা দেয়। যাহোক আল্লাহ্ তা'লা তখন তাকে মারধর বা কঠোরতার কুপ্রভাব থেকে রক্ষা করেছেন। মায়ের মমতা সর্বজন বিদিত, তিনি অবশ্যই আদরও করতেন, শুধু মারধরই করতেন– এমন নয়। পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ থেকে স্পষ্ট যে, সত্যিই তার মাঝে বীরত্ব ও সাহসিকতা সৃষ্টি হয়েছিল। কী কারণে সৃষ্টি হয়েছে তা আল্লাহ্ই ভালো জানেন। কিন্তু যা-ই হোক, তার ওপর শৈশবের এই মারধরের নেতিবাচক কোন প্রভাব পড়ে নি। এখন যদি কেউ এখানে এ পন্থা অবলম্বনের চেষ্টা করে তাহলে সাথে সাথে সোশ্যাল সার্ভিসের লোকেরা এসে সন্তানদের নিয়ে যাবে। তাই মায়েরা আবার এমন পন্থা অবলম্বনের চেষ্টা করবেন না।

হযরত যুবায়ের (রা.) ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর তার চাচা তাকে একটি চাটাইয়ে মুড়িয়ে ধোঁয়া দিতো যেন তিনি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে কুফরি বা অবিশ্বাসে ফিরে যান। কিন্তু তিনি বারবার এ কথাই বলতেন যে, এখন আর আমি কুফরিতে প্রত্যাবর্তন করব না।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তার সম্পর্কে লিখতে গিয়ে এ ঘটনাটি বর্ণনা করে বলেন, যুবায়ের বিন আওয়াম (রা.) খুবই সাহসী এক যুবক ছিলেন। ইসলামের বিজয়ের যুগে তিনি এক অসাধারণ সেনাপতি প্রমাণিত হয়েছেন। তার চাচাও তাকে খুবই অত্যাচার ও নিপীড়ন করত। চাটাইয়ে মুড়িয়ে নীচে থেকে ধোঁয়া দিত যেন তার শ্বাস রুদ্ধ হয়ে যায় আর এরপর বলত, ইসলাম পরিত্যাগ করবে কিনা বল? কিন্তু তিনি এসব নিপীড়ন ও নির্যাতন সহ্য করতেন এবং উত্তরে এটিই বলতেন যে, সত্য বুঝার পর এখন আমি তা অস্বীকার করতে পারব না।

হিশাম বিন উরওয়া তার পিতার পক্ষ থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, হযরত যুবায়ের (রা.)-এর বাল্যকালে একবার মক্কায় এক ব্যক্তি তার সাথে ঝগড়া আরম্ভ করে দেয় আর তাদের মাঝে হাতাহাতি হয়ে যায়। সম্ভবত সেই ব্যক্তি কোন কঠোর ব্যবহার করে থাকবে। তিনি ছোট বালক ছিলেন আর সেই ব্যক্তি বয়স্ক কোন পুরুষ ছিল। যাহোক এই লড়াইয়ে তিনি সেই ব্যক্তির হাত ভেঙে দেন এবং গুরুতরভাবে আহত করেন। হযরত সফিয়া (রা.)-কে দেখানোর জন্য সেই ব্যক্তিকে বাহনে চড়িয়ে আনা হয় যে, দেখুন, আপনার ছেলে এর কী দুরবস্থা করেছে। হযরত সফিয়া (রা.) জিজ্ঞেস করেন, তার কী হয়েছে? লোকেরা বলে, হযরত যুবায়ের (রা.) তার সাথে মারামারি করেছে। অপরাধ কার ছিল তা তারা বলে নি। যাহোক মারামারি হয়েছে। হযরত সফিয়া (রা.) হযরত যুবায়ের (রা.)-এর এই বীরত্ব দেখে নিম্নোক্ত পঙ্‌ক্তি পাঠ করেন,

কাইফা রাআয়তা যাবরান
আ-আকেতান হাসেবতাহু আম তামরা
আম মুশমাইল্লান সাকরান

অর্থাৎ তুমি যুবায়েরকে কেমন দেখলে? তাকে কি পনির বা খেজুরের মতো ভেবেছিলে যে, সহজেই খেয়ে ফেলবে আর তার সাথে যাচ্ছেতাই করবে? সে তো ক্ষিপ্র ঈগলের ন্যায়, তুমি তাকে এমন ঈগলের ন্যায় পেয়ে থাকবে যে ক্ষিপ্র গতিতে হামলা করে।

হযরত যুবায়ের (রা.) ইথিওপিয়ার উভয় হিজরতেই অংশগ্রহণ করেছিলেন। হিজরত করে মদিনায় আসার পর তিনি হযরত মুনযের বিন মুহাম্মদ (রা.)-এর বাড়িতে অবস্থান করেন। হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম (রা.)-এর স্ত্রী হযরত আসমা (রা.) হতে বর্ণিত হাদীসে তিনি বলেন, আমি যখন হিজরতের উদ্দেশে মক্কা থেকে যাত্রা করি তখন আমি অন্তঃসত্ত্বা ছিলাম।

তিনি বলেন, আমি কুবায় যাত্রাবিরতি দেই আর সেখানেই আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের ভূমিষ্ট হয় এরপর আমি তাকে নিয়ে মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হই। তিনি (সা.) তাকে নিজের কোলে তুলে নেন। এরপর তিনি একটি খেজুর আনতে বলেন (আর তা আনা হলে) তিনি তা চিবিয়ে নেন। অতঃপর সেই শিশুর মুখে তিনি (সা.) প্রথমে নিজ মুখের লালা দেন। তার পেটে সর্বপ্রথম জিনিস যা গিয়েছিল তা ছিল রসূল্লাহ্ (সা.)-এর পবিত্র লালা। এরপর মহানবী (সা.) খেজুর চিবিয়ে তার মুখে দেন এবং তার কল্যাণের জন্য দোয়া করেন। তিনিই ছিলেন ইসলামের ইতিহাসে জন্ম নেয়া প্রথম শিশু। সহীহ্ মুসলিমের রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত আসমা (রা.)-এর পুত্রের নাম রেখেছিলেন আব্দুল্লাহ্। সাত কিংবা আট বছর বয়সে উপনীত হওয়ার পর তিনি বয়আত করার জন্য নবী করীম (সা.)-এর সমীপে আসেন। তার পিতা হযরত যুবায়ের (রা.) তাকে নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন যে, যাও! বয়আত কর। মহানবী (সা.) তাকে নিজের দিকে আসতে দেখে মুচকি হাসেন এবং এরপর তার বয়আত গ্রহণ করেন। মক্কায় মুহাজেরদের মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করার সময় রসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত যুবায়ের (রা.) ও হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসুদ (রা.)-এর মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেছিলেন। মদিনায় হিজরতের পর আনসারদের সাথে মুহাজেরদের ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপনের সময় হযরত সালেমা বিন সালামা (রা.) তার ধর্মভাই হন। হযরত যুবায়ের (রা.) তার পুত্রদের নাম শহীদ (সাহাবীদের) নামের সাথে মিলিয়ে রেখেছিলেন এই আশায় যে আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে শাহাদাত বরণের সৌভাগ্য দান করবেন। আব্দুল্লাহ্‌র নাম আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশ (রা.)-এর নামানুসারে, মুনযেরের নাম মুনযের বিন আমর (রা.)-এর নামানুসারে, উরওয়ার নাম উরওয়া বিন মাসুদ (রা.)-এর নামানুসারে, হামজার নাম হামজা বিন আব্দুল মুত্তালিব (রা.)-এর নামানুসারে, জাফরের নাম জাফর বিন আবু তালেব (রা.)-এর নামে, মুসআবের নাম মুসআব বিন উমায়ের (রা.)-এর নামানুসারে, উবায়দার নাম উবায়দা বিন হারেস (রা.)-এর নামানুসারে, খালেদের নাম খালেদ বিন সাঈদ (রা.)-এর নামানুসারে আর আমরের নাম আমর বিন সাঈদ (রা.)-এর নামানুসারে রাখেন। হযরত আমর বিন সাঈদ (রা.) ইয়ারমুকের যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। এটি কতটা সঠিক তা জানা নেই, কেননা হযরত আব্দুল্লাহ্‌র জন্মের সময় অনুযায়ী যদি তিনি (ইসলাম ধর্মে) প্রথম শিশু হয়ে থাকেন তাহলে তিনি কত সনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন আর তখন পর্যন্ত কারো শাহাদত হয়েছিল কিনা তা আল্লাহ্ তা'লাই ভালো জানেন। কিন্তু যাহোক, সেসব বুযূর্গের নামানুসারে তিনি এ নামগুলো রেখেছিলেন।

উরওয়া বিন যুবায়ের (রা.) বর্ণনা করেন যে, হযরত যুবায়ের (রা.) এত দীর্ঘকায় ছিলেন যে, তিনি বাহনে আরোহন করলে তার পা মাটি স্পর্শ করত। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়ের (রা.) বলেন, আমি আমার পিতা অর্থাৎ হযরত যুবায়ের (রা.)-কে জিজ্ঞেস করি যে, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসুদ (রা.) এবং অন্যান্য সাহাবীদের যেভাবে আমি হাদীস বর্ণনা করতে শুনি, অর্থাৎ তারা মহানবী (সা.)-এর বরাতে অনেক হাদীস বর্ণনা করেন, আপনার কাছ থেকে তেমনটি শুনি না– এর কারণ কী? উত্তরে তিনি (রা.) বলেন, ইসলাম গ্রহণের পর থেকে আমি কখনোই নবী করীম (সা.) থেকে পৃথক হই নি। কিন্তু মহানবী (সা.)-কে আমি একথা বলতেও শুনেছি যে, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার প্রতি মিথ্যা কথা আরোপ করে সে জাহান্নামে নিজের ঠিকানা বানায়। এর অর্থ এটি নয় যে, বাকিরা মিথ্যারোপ করতেন, বরং সতর্কতা অবলম্বন করাকে আমি নিজের জন্য উত্তম মনে করি। যদিও সেখানে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা আরোপের (কথা বলা হয়েছে) কিন্তু তিনি এতটা সতর্ক ছিলেন যে, তিনি বলতেন, ভুল করেও যেন কোন কথা আরোপ করে না দেই আর এভাবে শাস্তিপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত না হয়ে পড়ি- এ ছিল তার সতর্কতা!

হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়্যেব (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম (রা.) হলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি আল্লাহ্‌র পথে নিজের তরবারি খাপ থেকে বের করেছিলেন। হযরত যুবায়ের (রা.) একবার মক্কার মাতাবেখ নামক উপত্যকায় বিশ্রাম করছিলেন, এমন সময় হঠাৎ আওয়াজ আসে যে, মুহাম্মদ (সা.)-কে হত্যা করা হয়েছে। তাৎক্ষণিকভাবে তিনি খাপ থেকে* নিজের তরবারি বের করতে করতে বিশ্রামস্থল থেকে বেরিয়ে পড়েন আর পথিমধ্যে মহানবী (সা.) তাকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করেন, যুবায়ের! থামো, কী হয়েছে? তিনি নিবেদন করেন, আপনাকে শহীদ করা হয়েছে এমন একটি কথা আমার কানে এসেছে। মহানবী (সা.) জিজ্ঞেস করেন, আমাকে যদি আসলেই শহীদ করে দেয়া হতো তাহলে তুমি কী করতে পারতে? তিনি বলেন, আল্লাহর কসম! সেক্ষেত্রে আমি সমস্ত মক্কাবাসীকে হত্যা করার সংকল্প করেছি। মহানবী (সা.) তখন তার জন্য বিশেষ দোয়া করেন। একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) তার তরবারির জন্যও দোয়া করেছিলেন।

হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়্যেব বলেন, আমি আশা করি তার পক্ষে মহানবী (সা.) এর দোয়া আল্লাহ্ তা'লা বিফল করবেন না। হযরত যুবায়ের বদর ও উহুদসহ অন্য সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সহযোদ্ধা ছিলেন। উহুদের যুদ্ধে তিনি মহানবী (সা.)-এর সাথে অনড়-অবিচল ছিলেন এবং তাঁর হাতে নিজ প্রাণ বিসর্জন দেয়ার শর্তে বয়আত করেন। মক্কা বিজয়কালে মুহাজেরদের তিনটি পতাকার মাঝে একটি পতাকা হযরত যুবায়ের-এর কাছে ছিল। বদরের যুদ্ধের দিন মহানবী (সা.)-এর সাথে কেবল দু'টি ঘোড়া ছিল যার একটিতে হযরত যুবায়ের আরোহিত ছিলেন। হযরত উরওয়া থেকে বর্ণিত, হযরত যুবায়ের-এর দেহে তরবারির তিনটি গভীর ক্ষতচিহ্ন ছিল, যেগুলোর ভিতরে আমি আমার আঙুল ঢুকিয়ে দিতাম। এর দু'টি আঘাত তিনি পেয়েছিলেন বদরের যুদ্ধে এবং অপর আঘাতটি পেয়েছিলেন ইয়ারমুকের যুদ্ধে।

মূসা বিন মুহাম্মদ নিজ পিতার কাছ থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত যুবায়ের বিন আওয়ামকে হলুদ পাগড়ির কারণে চেনা যেতো। বদরের যুদ্ধে হযরত যুবায়ের হলুদ পাগড়ি বেঁধে রেখেছিলেন আর মহানবী (সা.) তাকে দেখে বলেন, ফেরেশতারা যুবায়েরের বেশে (হলুদ পাগড়ি বেঁধে) অবতরণ করেছে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদের সাহায্যার্থে যে ফেরেশতাদের প্রেরণ করেছিলেন, তারাও একই ধরনের পাগড়ি পরিধান করে যুদ্ধ করছে।

হিশাম বিন উরওয়া নিজ পিতার বরাতে বর্ণনা করেন যে, হযরত যুবায়ের বলতেন, বদরের যুদ্ধের দিন উবায়দা বিন সাঈদের মুখোমুখি হই আর সে আপাদমস্তক বর্মাবৃত ছিল এবং তার কেবল চোখ দু'টো দেখা যাচ্ছিল। তার উপনাম ছিল আবু যাতিল কারশ্। সে বলে, আমি হলাম আবু যাতিল কারশ্। এ কথা শুনতেই আমি তার ওপর বর্শা দিয়ে আক্রমণ করি এবং তার চোখে আঘাত হানি। সে সেখানেই মারা যায়। হিশাম বলতেন, আমাকে বলা হয়েছে যে, হযরত যুবায়ের বলতেন, আমি তার দেহে আমার পা রেখে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে বহু কষ্টে সেই বর্শা টেনে বের করি। বর্শার উভয় পাশ বাঁকা হয়ে যায়, অর্থাৎ এত জোরে তিনি আঘাত হেনেছিলেন। উরওয়া বলতেন, মহানবী (সা.) হযরত যুবায়েরের কাছে সেই বর্শাটি চেয়ে পাঠান। তিনি মহানবী (সা.)-এর কাছে তা উপস্থাপন করেন। মহানবী (সা.) যখন পরলোক গমন করেন, তখন হযরত যুবায়ের সেটি ফেরত নেন। এরপর হযরত আবু বকর (রা.) উক্ত বর্শাটি চাইলে হযরত যুবায়ের তা তাকে দিয়ে দেন। হযরত আবু বকর (রা.) যখন পরলোক গমন করেন, তখন হযরত উমর (রা.) তার কাছে সেই বর্শাটি চান এবং তিনি তাকে তা দিয়ে দেন। হযরত উমর (রা.) এর মৃত্যুর পর হযরত যুবায়ের তা পুনরায় ফেরত নিয়ে নেন। পরবর্তীতে হযরত উসমান (রা.) তার কাছে সেই বর্শা চাইলে হযরত যুবায়ের তা তাকে দিয়ে দেন। হযরত উসমান (রা.) -এর শাহাদাতের পর হযরত আলী (রা.)-এর বংশধরগণ

সেটি লাভ করে। পরিশেষে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়ের তাদের কাছ থেকে সেটি ফেরত নেন এবং আমৃত্যু সেটি তার কাছেই ছিল যতদিন না হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবায়েরকে শহীদ করা হয়।

হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম (রা.) বর্ণনা করেন, উহুদের যুদ্ধের দিন মহানবী (সা.) আমার জন্য নিজ পিতামাতা উভয়কে একত্রিত করেন, অর্থাৎ আমাকে বলেন, আমার পিতামাতা তোমার জন্য নিবেদিত হোন। হযরত যুবায়ের (রা.) বর্ণনা করেন যে, উহুদের যুদ্ধের দিন এক মহিলাকে সম্মুখ থেকে খুব দ্রুত গতিতে আসতে দেখা যায়। আরেকটু হলেই তিনি শহীদদের লাশ দেখে ফেলতেন। মহানবী (সা.) এটিকে পছন্দ করন নি যে, কোন মহিলা তাদের (অর্থাৎ শহীদদের লাশ) দেখবে, কেননা নির্মমভাবে তাদের অঙ্গচ্ছেদ করা হয়েছিল। এ কারণে তিনি (সা.) বলেন, এই মহিলাকে থামাও, এই মহিলাকে বাধা দাও। হযরত যুবায়ের (রা.) বলেন, আমি বুঝতে পারি যে, তিনি আমার মা সফিয়া। অতএব আমি তার দিকে ছুটে যা ই এবং তিনি শহীদদের লাশের কাছে পৌঁছানোর পূর্বেই আমি তার নিকট পৌঁছে যাই। আমাকে দেখে তিনি আমার বুকে করাঘাতে আমাকে পিছনে ঠেলে দেন। তিনি একজন শক্তিশালী মহিলা ছিলেন। অতঃপর তিনি বলেন, সরে যাও, তোমার সাথে আমার কোন কথা নেই, অর্থাৎ আমি তোমার সাথে কোন কথা বলতে চাই না, তুমি দূরে সরে যাও, আমি তোমার কোন কথাই শুনব না। আমি বললাম, মহানবী (সা.) আপনাকে এই লাশগুলো না দেখার কসম দিয়েছেন। এটি শুনতেই তিনি বিরত হন, অর্থাৎ মহানবী (সা.)-এর বরাতে যখন কথা বলা হয়, তখন তিনি থেমে যান আর নিজের কাছে থাকা দুটি কাপড় বের করে বলেন, এ দুটি কাপড় আমি আমার ভাই হামযার জন্য নিয়ে এসেছি, কেননা আমি তার শাহাদাতের সংবাদ পেয়েছি। তুমি এই কাপড়দুটো তার কাফন হিসেবে ব্যবহার করো। একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত সফিয়া বলেন, আমি জানি যে, আমার ভাইয়ের লাশ বিকৃত করা হয়েছে এবং তা খোদার পথেই হয়েছে। আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করতে গিয়ে হযরত হামযা (রা.)-এর সাথে যে আচরণই করা হয়েছে তাতে আমি কেন সন্তুষ্ট হব না? আমি ইনশাআল্লাহ্ ধৈর্য ধারণ করব এবং তাঁরই সমীপে এর প্রতিদান কামনা করব। হযরত যুবায়ের (রা.) মায়ের এই উত্তর শুনে মহানবী (সা.)-এর নিকট ফিরে আসেন এবং সমস্ত ঘটনা খুলে বলেন। মহানবী (সা.) বলেন, সফিয়াকে ভাইয়ের লাশের কাছে যেতে দাও। হযরত সফিয়া (রা.) সামনে এগিয়ে গিয়ে তার ভাইয়ের লাশ দেখেন এবং তার জন্য দোয়া করার পর বলেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। অতঃপর আল্লাহ্ তা'লার দরবারে তার মাগফেরাতের দোয়া করেন। এরপর মহানবী (সা.) তাকে দাফন করার নির্দেশ দেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা উক্ত কাপড় দুটি যখন হযরত হামযাকে কাফন হিসেবে পরাতে যাই তখন দেখি তার পাশে একজন আনসার শহীদ হয়ে পড়ে আছেন আর তার সাথেও সেরূপ আচরণই করা হয়েছিল যা হযরত হামযা (রা.)-এর সাথে করা হয়েছিল। হযরত হামযা (রা.) এর কাফনের জন্য দুটি কাপড় ব্যবহার করব আর সেই আনসার একটি কাপড়ও পাবেন না– এটি ভেবে আমরা ভীষণ লজ্জিত হলাম। তাই আমরা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি যে, একটি কাপড় দিয়ে হযরত হামযা (রা.)-কে এবং অপরটি দিয়ে আমরা সেই আনসার সাহাবীকে কবরস্থ করব। পরিমাপ করে আমরা দেখতে পাই যে, উক্ত দুইজনের মাঝে একজন তুলনামূলকভাবে দীর্ঘকায় ছিলেন। তাই আমরা লটারি করি এবং লটারিতে যার নামে যে কাপড় আসে তাকে সেটি দিয়েই দাফন করি। তারপরও তা (দেহ আবৃত করার জন্য) যথেষ্ট ছিল না বরং ঘাস দিতে হয়েছিল।

হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ কর্তৃক বর্ণিত, পরিখার যুদ্ধে মহানবী (সা.) বলেন, কেউ কি আমাকে বনু কুরায়যার সংবাদ এনে দিতে পারে? তখন হযরত যুবায়ের (রা.) বলেন, আমি উপস্থিত আছি। পুনরায় মহানবী (সা.) বলেন, কেউ কি আছে যে আমাকে বনু কুরায়যার

সংবাদ এনে দেবে? হযরত যুবায়ের (রা.) আবারো বলেন, আমি উপস্থিত আছি। মহানবী (সা.) তৃতীয়বার বলেন যে, কেউ আছে কি যে আমাকে বনু কুরায়যার সংবাদ দিতে পারে? হযরত যুবায়ের (রা.) বলেন, আমি উপস্থিত আছি। তখন মহানবী (সা.) বলেন, প্রত্যেক নবীর হাওয়ারী (বা বিশেষ শিষ্য) হয়ে থাকে আর আমার হাওয়ারী হলেন, যুবায়ের। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.) এক ব্যক্তিকে বলতে শুনেছেন যে বলতো, আমি মহানবী (সা.)-এর হাওয়ারীর পুত্র। এটি শুনে হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা.) বলেন, তুমি যদি হযরত যুবায়ের (রা.)-এর সন্তানদের মধ্য হতে হয়ে থাক তাহলে ঠিক আছে, অন্যথায় নয়। তখন জিজ্ঞেস করা হয় যে, হযরত যুবায়ের (রা.) ছাড়া আর কেউ আছে কি যাকে মহানবী (সা.)-এর হাওয়ারী বলা হতো? উত্তরে হযরত ইবনে উমর (রা.) বলেন, আমার জানামতে আর কেউ নেই। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়ের (রা.) বর্ণনা করেন যে, আহযাবের যুদ্ধের দিন আমাকে ও উমর বিন আবি সালামাকে মহিলাদের দেখাশুনার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। আমি তাকিয়ে দেখতে পেলাম হযরত যুবায়ের তার ঘোড়ায় আরোহিত। আমি তাকে বনু কুরায়যার (দুর্গের) দিকে দু'বার বা তিনবার যেতে দেখি। ফিরে এসে আমি বললাম, আব্বু! আমি আপনাকে এদিক সেদিক যেতে দেখেছিলাম। তিনি বলেন, হে পুত্র! তুমি কি সত্যিই আমাকে দেখেছিলে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি বলেন, মহানবী (স.) বলেছিলেন, কে বনু কুরায়যার কাছে যাবে এবং আমাকে তাদের সংবাদ এনে দিবে? এটি শুনে আমি চলে যাই। যখন আমি ফিরে এসে মহানবী (স.)-কে তাদের সংবাদ প্রদান করি তখন তিনি আমার জন্য তাঁর (সা.) পিতামাতা উভয়ের নাম নেন। অর্থাৎ তিনি (সা.) বলেন, আমার পিতামাতা তোমার জন্য নিবেদিত।

খায়বারের যুদ্ধে ইহুদিদের প্রসিদ্ধ নেতা মরহব হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামার হাতে নিহত হয়। তখন তার ভাই ইয়াসের যুদ্ধক্ষেত্রে আসে এবং 'মান ইয়ুবারেয' ধ্বনি উচ্চকিত করে, অর্থাৎ কে আছে যে আমার সাথে লড়াই করবে? হযরত যুবায়ের তার সাথে লড়াইয়ের জন্য এগিয়ে আসেন। তখন হযরত সফিয়া মহানবী (সা.)-এর কাছে নিবেদন করেন যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! মনে হচ্ছে আজ আমার পুত্রের শাহাদত লাভের সৌভাগ্য হবে। মহানবী (স.) বলেন, না, বরং তোমার ছেলে তাকে হত্যা করবে। হযরত যুবায়ের ইয়াসেরের সাথে লড়াইয়ের জন্য অগ্রসর হন এবং সে হযরত যুবায়ের-এর হাতে নিহত হয়। হযরত যুবায়ের ঐ তিন ব্যক্তিরও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাদেরকে মহানবী (স.) সেই নারীর সন্ধানে পাঠিয়েছিলেন যে (মক্কার) কাফেরদের জন্য হযরত হাতেব বিন আবি বালতা'-র পত্র নিয়ে যাচ্ছিল। যদিও এর উল্লেখ পূর্বে হয়েছে, কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে এখানেও কিছুটা উল্লেখ করছি।

হযরত আলী থেকে বর্ণিত যে, মহানবী (সা.) আমাকে ও হযরত যুবায়ের এবং হযরত মিক্বদাদকে এক স্থানে প্রেরণের সময় বলেন, যখন তোমরা রওযায়ে খাখ-এ পৌঁছবে, এক মহিলাকে পাবে যার কাছে একটি পত্র আছে। তোমরা তার কাছ থেকে সেই পত্রটি নিয়ে ফিরে আসবে। নির্দেশ অনুসারে আমরা যাত্রা আরম্ভ করি আর আমরা রওযায়ে খাখ (এটি মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্তী একটি স্থানের নাম) পৌঁছি যাই এবং সেখানে সত্যিই এক নারীর দেখা পাই। আমরা তাকে বলি, তোমার কাছে যে পত্র আছে তা বের করে দাও। সে বলে, আমার কাছে কোন পত্র নেই। তখন আমরা তাকে বলি, হয় তুমি স্বেচ্ছায় পত্রটি বের করে দাও নয়তো আমরা কঠোর হবো, প্রয়োজনে তোমাকে বিবস্ত্র করব তথা এর জন্য আমাদের যা-ই করতে হয় আমরা করব। তখন নিরুপায় হয়ে সে তার খোপা থেকে একটি পত্র বের করে আমাদের

দিয়ে দেয়। উক্ত পত্র নিয়ে আমরা মহানবী (সা.)-এর কাছে উপস্থিত হই। পত্রটি খুলে দেখা গেল সেটি হযরত হাতেব বিন আবি বালতা’-র পক্ষ থেকে মক্কার কয়েকজন মুশরিকের উদ্দেশ্যে লেখা, যাতে মহানবী (সা.)-এর একটি সিদ্ধান্তের সংবাদ দেয়া হয়েছিল। মহানবী (সা.) তাকে জিজ্ঞেস করেন যে, হাতেব! ব্যাপার কি? তুমি এটি কি করেছ? তিনি বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমার বিষয়ে তাড়াহুড়া করবেন না। কুরাইশদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই, কিন্তু আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছি। আসলে আমি তাদের প্রতি একটি অনুগ্রহ করতে চেয়েছিলাম। আমি এ কাজ কাফের হয়ে বা মুরতাদ হয়ে অথবা ইসলাম গ্রহণের পর কুফর বা অবিশ্বাসকে পছন্দ করে করি নি। বরং তাদের প্রতি কেবল একটি অনুগ্রহ করার মানসে আমি এটি করেছি। তার কথা শুনে মহানবী (স.) হযরত আবি বালতা’ সম্পর্কে বলেন, সে তোমাদের সাথে সত্য কথা বলেছে। হযরত উমর তখন অত্যন্ত ক্রোধান্বিত ছিলেন, ক্রোধে দিশেহারা হয়ে তিনি মহানবী (স.)-এর কাছে নিবেদন করেন যে, আমাকে এই মুনাফিকের শিরোচ্ছেদ করার অনুমতি দিন। মহানবী (সা.) বলেন, তিনি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। তুমি হয়ত জাননা যে, আল্লাহ্ তা’লা বদরে অংশগ্রহণকারীদের (হৃদয়ে) আকাশ থেকে উঁকি দিয়ে দেখেছেন এবং বলেছেন, তোমরা যা-ই কর না কেন, আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছি। রসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন মক্কা জয় করেন, তখন হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম সৈন্যবাহিনীর বামপাশে ছিলেন এবং হযরত মিক্বদাদ বিন আসওয়াদ সেনাবাহিনীর ডান অংশের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। রসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন মক্কায় প্রবেশ করেন এবং মানুষ নিশ্চিন্ত হয়ে যায়, তখন উক্ত দু’জন অর্থাৎ হযরত যুবায়ের ও হযরত মিক্বদাদ (রা.) অশ্বারোহী অবস্থায় আসেন। রসূলুল্লাহ্ (সা.) উঠে গিয়ে নিজের চাদর দিয়ে তাদের মুখ থেকে ধুলোবালি মুছে দিতে থাকেন এবং বলেন, আমি ঘোড়ার জন্য দুই ভাগ এবং আরোহীদের জন্য এক ভাগ নির্ধারণ করেছি। যে তাদেরকে কম দিবে, আল্লাহ্‌ও তাকে কম দিন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) হযরত যুবায়েরের একটি ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন হুবল নামক প্রতিমার উপর তাঁর ছড়ি দিয়ে আঘাত করেন এবং তা এর নির্ধারিত স্থান থেকে পড়ে গিয়ে ভেঙে যায়, তখন হযরত যুবায়ের আবু সুফিয়ানের দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে বলেন, আবু সুফিয়ান! মনে আছে, উহুদের দিন যখন মুসলমানরা ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায় একদিকে দাঁড়িয়ে ছিল, তখন তুমি দম্ভভরে এই ঘোষণা দিয়েছিলে যে ও’লু হুবল- ও’লু হুবল অর্থাৎ হুবলের মর্যাদা উন্নীত হোক- হুবলের মর্যাদা উন্নীত হোক; আর এ-ও (বলেছিলে) যে, হুবলই তোমাদেরকে উহুদের দিন মুসলমানদের উপর বিজয় দিয়েছে? আজ তুমি দেখতে পাচ্ছ যে, তোমার সামনে হুবলের টুকরো পড়ে আছে! আবু সুফিয়ান বলে, যুবায়ের, এসব কথা এখন বাদ দাও! আজ আমরা খুব ভালোভাবেই দেখতে পাচ্ছি যে, যদি মুহাম্মদ (রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খোদা ছাড়া অন্য কোন খোদা থাকত, তাহলে আমরা যা দেখছি– এরকম কখনোই হতো না! অতএব তিনি-ই (প্রকৃত) খোদা, যিনি মহানবী (সা.)-এর খোদা।

হুনায়নের যুদ্ধের দিন হাওয়াযেন গোত্রের আকস্মিক তির বর্ষণ, উপরন্তু সেদিন ইসলামী বাহিনীতে দু’হাজার নওমুসলিম অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ফলশ্রুতিতে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যে, আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) রণক্ষেত্রে নিঃসঙ্গ রয়ে যান। হযরত আব্বাস (রা.) মহানবী (সা.)-এর খচ্চরের লাগাম ধরে রেখেছিলেন। কাফেরদের নেতা মালেক বিন অওফ একটি গিরিপথে অশ্বারোহীদের সাথে দাঁড়িয়ে ছিল; সে দেখল যে, কিছু অশ্বারোহী আসছে। মালেক বিন অওফ জিজ্ঞেস করল, এরা কারা? তার সঙ্গীরা বলল, এরা কিছু লোক যারা নিজেদের বর্শা ঘোড়ার দু’কানের মাঝে রেখেছে। সে বলল, এরা বনু সুলায়েম গোত্রের লোক; তাদের পক্ষ থেকে তোমাদের কোন আশঙ্কা নেই। তারা আসে এবং উপত্যকার দিকে চলে যায়। এরপর সে আরেকটি অশ্বারোহী দলকে এগিয়ে আসতে দেখে। মালেক জিজ্ঞেস করে, কী দেখতে পাচ্ছ?

তারা বলল, এরা বর্শা হাতে কিছু লোক। সে বলল, এরা অওস ও খাযরাজ গোত্রের লোক; তাদের পক্ষ থেকেও তোমাদের কোন ভয় নেই। গিরিপথের নিকটে পৌঁছে তারাও বনু সুলায়েমের মতো উপত্যকার দিকে এগিয়ে যায়। এরপর একজন অশ্বারোহী চোখে পড়ে। মালেক তার সঙ্গীদের জিজ্ঞেস করে, কী দেখতে পাচ্ছ? তারা বলল, একজন অশ্বারোহী আসছে; দীর্ঘকায়, কাঁধে বর্শা, মাথায় লাল পট্টি বেঁধে রেখেছে। মালেক বলল, তিনি হলেন যুবায়ের বিন আওয়াম। লাতের কসম, তার সাথে তোমাদের লড়াই হবে; এখন অবিচল হও। হযরত যুবায়ের যখন গিরিপথে পৌঁছেন আর অশ্বারোহীরা তাকে দেখতে পায়। হযরত যুবায়ের পাহাড়ের মতো তাদের সামনে দাঁড়িয়ে যান এবং বর্শা দিয়ে এমনভাবে আক্রমণ করেন যে, গিরিপথ উক্ত কাফের নেতাদের কাছ থেকে মুক্ত করে নেন।

উরওয়া নিজ পিতার বরাতে বর্ণনা করেন যে, ইয়ারমূকের যুদ্ধে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাহাবীরা হযরত যুবায়েরকে বলেন, আপনি কি হামলা করবেন না যেন আমরাও আপনার সাথে হামলা করতে পারি। হযরত যুবায়ের বলেন, আমি যদি আক্রমণ করি (তোমরা আমার সঙ্গ দিতে পারবে না) তোমরা পিছিয়ে যাবে। তারা বলেন, আমরা পেছনে পড়ব না। অতঃপর হযরত যুবায়ের কাফেরদের ওপর এত তড়িৎ হামলা করেন যে, তাদের ব্যূহ ভেদ করে এগিয়ে যান এবং পেছন ফিরে দেখেন যে, একজনও তার সাথে নেই। অতঃপর তিনি ফিরে আসতে উদ্যত হলে কাফেররা তার ঘোড়ার লাগাম ধরে ফেলে এবং তার কাঁধে দু'টি আঘাত হানে। (তার পাওয়া আঘাত গুলোর মাঝে) সেই বড় আঘাতটিও ছিল যা বদরের যুদ্ধে তিনি পেয়েছিলেন।

উরওয়া বলতেন, আমি শৈশবে আমার আঙুল সেসব আঘাতের স্থানে ঢুকিয়ে খেলা করতাম। উরওয়া আরো বলেন, সে সময় ইয়ারমূকের যুদ্ধে হযরত যুবায়েরের সাথে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়েরও ছিলেন। তখন তার বয়স ছিল দশ বছর। হযরত যুবায়ের তাকে ঘোড়ায় বসিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং এক ব্যক্তিকে তার নিরাপত্তার দায়িত্বে নিযুক্ত করেছিলেন।

সিরিয়া বিজয়ের পর হযরত আমর বিন আস (রা.)-এর নেতৃত্বে মিশরে আক্রমণ করা হয়। মিশর এর বিজেতা হযরত আমর বিন আস আলেকজান্দ্রিয়া আক্রমণের পরিকল্পনা করেন, তখন আলেকজান্দ্রিয়ার দক্ষিণে নীল নদের তীরে তাবু টানানো হয়েছিল, এ কারণে এটিকে ফুসতাত বলা হয় আর এই স্থানটিই পরবর্তীতে শহরে রুপান্তরিত হয়। এ শহরেরই নতুন অংশ বর্তমানে কায়রো হিসেবে পরিচিত। তারা এটি ঘেরাও করে। দুর্গের দৃঢ়তা এবং সেনাস্বল্পতা দেখে হযরত আমর বিন আস হযরত উমরের কাছে শক্তিবৃদ্ধির জন্য সেনা প্রেরণের আবেদন করেন। হযরত উমর দশ হাজার সৈন্য এবং চারজন সেনাকর্মকর্তা প্রেরণ করেন। তিনি বলেন, তাদের মধ্য থেকে প্রত্যেক সেনাকর্মকর্তা এক হাজার সৈন্যের সমান। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন হযরত যুবায়ের (রা.)। তিনি পৌঁছলে হযরত আমর বিন আস অবরোধ বা ঘেরাও করার দায়িত্ব তার হাতে ন্যস্ত করেন। তিনি ঘোড়ায় আরোহন করে দুর্গের চতুষ্পার্শ্ব প্রদক্ষিণ করেন, সৈনিকদের সারিবদ্ধ করেন, অশ্বারোহী এবং পদাতিকদের বিভিন্ন স্থানে নিযুক্ত করেন আর কামানের মাধ্যমে দুর্গে পাথর নিক্ষেপ করা আরম্ভ করেন। অবরোধ সাত মাস স্থায়ী হয়, কিন্তু জয়-পরাজয়ের কোন সিদ্ধান্ত হয় নি। হযরত যুবায়ের একদিন বলেন, আজ আমি মুসলমানদের জন্য আত্মোৎসর্গ করছি। একথা বলে তিনি তরবারি বের করেন এবং সিঁড়ি লাগিয়ে দুর্গের পাঁচিলে আরোহন করেন। আরো কতিপয় সাহাবীও তার সঙ্গ দেন। প্রাচীরে চড়ে সবাই একযোগো আল্লাহু আকবর ধ্বনি উচ্চকিত করেন আর একই সাথে পুরো সেনাবাহিনী এত জোরে স্লোগান দেয় যে, দুর্গের ভূমি কেঁপে উঠে। খ্রিষ্টানরা মনে করে যে, মুসলমানরা দুর্গের ভিতরে এসে গেছে, ফলে তারা দিশেহারা হয়ে পালাতে আরম্ভ করে।

হযরত যুবায়ের প্রাচীর থেকে নেমে দুর্গের দ্বার খুলে দেন এবং পুরো বাহিনী ভিতরে প্রবেশ করে।

হযরত ওমর (রা.)-এর মৃত্যুর সময় খিলাফত কমিটির সদস্যদের নাম প্রস্তাব করা এবং তাঁর মৃত্যুর পরে খিলাফত নির্বাচনের ঘটনা বুখারী শরীফে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত উমর (রা.)-এর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে লোকজন বলে, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি কাকে খলীফা নিযুক্ত করবেন সেসম্পর্কে ওসীয়্যত করুন । তিনি বলেন, আমি সেই কয়েক ব্যক্তির চেয়ে আর কাউকে এই খিলাফতের অধিক যোগ্য মনে করি না যাদের প্রতি আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) মৃত্যুর সময় সন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি হযরত আলী, হযরত উসমান, হযরত যুবায়ের, হযরত তালহা, হযরত সা'দ এবং হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.)-এর নাম উল্লেখ করে বলেন, আব্দুল্লাহ্ বিন উমর তোমাদের সাথে থাকবেন, কিন্তু খিলাফতের ওপর তার কোন অধিকার থাকবে না। অতঃপর বলেন, সা'দ (রা.) যদি খিলাফত লাভ করেন তাহলে তিনিই খলীফা হবেন, নতুবা তোমাদের মাঝে যাকেই আমীর নিযুক্ত করা হয়, সে যেন নিয়মিত সা'দের (রা.) পরামর্শ নেয়, কেননা আমি তাকে এজন্য অপসারণ করি নি যে, তিনি কোন কাজ করতে অপারগ ছিলেন আর এজন্যও নয় যে, তিনি কোন খেয়ানত বা অসৎ পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। এছাড়া তিনি আরো বলেন, আমার পর নির্বাচিত খলীফাকে প্রথমে আমি মুহাজেরদের বিষয়ে ওসীয়্যত করছি যে, তিনি যেন তাদের অধিকার প্রদানের বিষয়ে সচেতন থাকেন এবং তাদের সম্মানের প্রতি যত্নবান হন। আর আমি আনসারদের সাথেও সদ্ব্যবহারের ওসীয়্যত করছি, কেননা তারা মুহাজেরদের পূর্বে ঈমানকে নিজেদের গৃহে স্থান দিয়েছেন। তাদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল তাকে যেন গ্রহণ করা হয়। তাদের মধ্যে যে দোষী তাকে যেন উপেক্ষা করা হয়। আমি তাঁকে (অর্থাৎ ভবিষ্যত খলীফাকে) সকল নগরিকের সাথে সদ্ব্যবহারের ওসীয়্যত করছি, কেননা তারা ইসলামের পৃষ্ঠপোষক, জাকাত সংগ্রহকারী এবং শত্রুপক্ষের ক্রোধের কারণ। সেইসাথে আরো ওসীয়্যত করছি যে মানুষের কাছ থেকে তাদের সম্মতিক্রমে কেবল ততটুকুই যেন নেয়া হয় যা তাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত থাকে আর আমি তাঁকে মরুবাসী আরবদের সাথে উত্তম ব্যবহারের ওসীয়্যত করছি, কেননা তারা আরবদের মূল আর ইসলামের মৌলিক উপকরণ। তাদের এমন সম্পদ থেকে যেন নেয়া হয় যা তাদের কোন কাজের নয়, অতঃপর সেগুলো যেন তাদেরই দরিদ্রদের মাঝে বিতরণ করে দেয়া হয়। আর আমি তাঁকে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.)-এর হাতে সোপর্দ করছি। যাদের সাথে অঙ্গীকার করা হয়েছে, সেই অঙ্গীকার যেন রক্ষা করা হয় আর তাদের সুরক্ষার যেন ব্যবস্থা নেয়া হয় এবং তাদের কাছ থেকেও যেন ততটাই নেয়া হয়, যতটুকু দেয়ার সাধ্য তাদের রয়েছে। হযরত উমর (রা.) মৃত্যু বরণের পর তাঁর দাফন-কাফন শেষে সেই ছয় ব্যক্তি একত্রিত হন, যাদের নাম হযরত উমর (রা.) উল্লেখ করেছিলেন। হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) বলেন, বিষয়টি তোমাদের মধ্য থেকে তিনজনের ওপর ন্যস্ত কর। হযরত যুবায়ের (রা.) বলেন, আমি আমার অধিকার হযরত আলীর (রা.) পক্ষে ছেড়ে দিচ্ছি, হযরত তালহা (রা.) বলেন আমি আমার অধিকার হযরত উসমানকে দিচ্ছি। হযরত সা'দ (রা.) বলেন- আমি আমার অধিকার হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফকে প্রদান করছি। হযরত আলী (রা.) ও হযরত উসমান (রা.)-কে হযরত আব্দুর রহমান বলেন, আপনাদের দু'জনের মধ্য থেকে যে-ই এই বিষয়ে নিজের অধিকার প্রত্যাহার করবে আমরা তার হাতেই এই দায়িত্ব ন্যস্ত করব আর আল্লাহ্ তা'লা এবং ইসলাম তার তত্ত্বাবধায়ক হবেন, তিনি আপনাদের মধ্য থেকে তাকেই নির্ধারণ করবেন যিনি তাঁর মতে সর্বত্তোম। এটি শুনে উভয় বুযুর্গ নীরব থাকেন। হযরত আব্দুর রহমান বলেন, আপনারা কী এ বিষয়টি আমার হাতে সোপর্দ করবেন? আল্লাহ্ তা'লা আমাকে দেখছেন, আপনাদের মধ্য থেকে যিনি শ্রেয় তাকে মনোনীত করার ক্ষেত্রে আমি কোন ত্রুটি

করব না। তখন তাদের উভয়েই সম্মত হন। অতঃপর হযরত আব্দুর রহমান তাদের দু'জনের মধ্যে থেকে একজনের হাত ধরে এক পাশে নিয়ে যান এবং বলেন, মহানবী (সা.)-এর সাথে আপনার আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে। আর ইসলামে আপনার যে মর্যাদা রয়েছে তা আপনি ভালোভাবে জানেন। আল্লাহ্ তা'লা আপনার তত্ত্বাবধায়ক। বলুন, আমি যদি আপনাকে আমীর নিযুক্ত করি তাহলে আপনি কি ন্যায়বিচার করবেন? আমি যদি উসমানকে আমীর হিসেবে নিযুক্ত করি তাহলে আপনি কি তার আনুগত্য করবেন এবং তার আদেশ মান্য করবেন? অতঃপর আব্দুর রহমান দ্বিতীয়জনকে নিভৃতে নিয়ে যান এবং তাকেও একই কথা বলেন। দৃঢ় অঙ্গীকার আদায়ের পর তিনি বলেন, হে উসমান! অর্থাৎ আব্দুর রহমান হযরত উসমানকে বলেন যে, আপনি হাত এগিয়ে দিন এবং তিনি তাঁর হাতে বয়আত করেন। এরপর হযরত আলী (রা.)ও তাঁর হাতে বয়আত করেন। অতঃপর পরিবারের সদস্যরা ঘরের ভেতর প্রবেশ করে আর তারাও হযরত উসমানের হাতে বয়আত করে। যাহোক এর বিস্তারিত বিবরণ পূর্বেও আমি তুলে ধরেছি। এখানেও তার বরাতে তুলে ধরলাম। হযরত যুবায়ের (রা.)-এর স্মৃতিচারণ এখনও চলমান আছে। বাকি ইনশাআল্লাহ্ আগামীতে বর্ণনা করা হবে।

এখন আমি কয়েকজন প্রয়াত ব্যক্তির জানাযার নামায পড়াব। এখন তাদের স্মৃতিচারণ করব। প্রথমে যার উল্লেখ করা হচ্ছে তিনি হলেন পেশাওয়ার জেলার ডোগ্রী গার্ডেন নিবাসী মাহমুদ আহমদ সাহেবের পুত্র শহীদ মে'রাজ আহমদ সাহেব। আহমদী বিরোধীরা গত ১২ আগস্ট, রাত ৯টায় তাকে তার মেডিকেল স্টোরের সামনে গুলি করে শহীদ করে, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ।

ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা হলো, মরহুম তার মেডিকেল স্টোরের কাজ শেষ করে রাত ৯ টায় বাসার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছিলেন। এমন সময় অজ্ঞাত পরিচয় লোকেরা গুলি করে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। শহীদ মরহুমের দেহে ৪টি গুলি বিদ্ধ হয়, যার ফলে তিনি ঘটনাস্থলেই মৃত্যু বরণ করেন। শাহাদাতের সময় তার বয়স ছিল প্রায় ৬১ বছর। শহীদ মরহুমের পুত্র স্নেহের ইয়াসের আহমদ ঘটনার কিছুক্ষণ পূর্বেই দোকান থেকে বাসার উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিল। মরহুমের মোবাইল থেকেই তার পুত্রকে ঘটনা সম্পর্কে সংবাদ দেয়া হয়। ছেলে যখন মেডিকেল স্টোরে ফিরে আসে ততক্ষণে মরহুম ইহধাম ত্যাগ করেন। শহীদের পরিবারে আহমদীয়াতের সূচনা ১৯১২ সনে তার দাদা মুকাররম আহমদ গুল সাহেব ও তার ভাই সাহেব গুল সাহেবের মাধ্যমে হয়েছিল যিনি পশতুর বিখ্যাত কবিও ছিলেন। এই বংশের সর্ম্পক ছিল পেশাওয়ারের শেখ মুহাম্মদীর সাথে। পরবর্তীতে তারা গয়ের মুবাঈনদের সাথে যুক্ত হয়, অর্থাৎ আমরা যাদেরকে লাহোরী জামা'ত বা পয়গামী বলি তাদের সাথে সম্পৃক্ত ছিল অর্থাৎ খলীফার হাতে বয়আত করেনি। মুকাররম মে'রাজ সাহেব নিজের তিন ভাইসহ ১৯৯০-৯১ সনে বয়আত করে আহমদীয়তভুক্ত হন। এরপর থেকে শাহাদাতের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তার বিরোধিতা অব্যাহত থাকে। তার কর্মচারীরাও শুধুমাত্র ধর্মীয় বিরোধিতার কারণে তার কাছে কাজ করতে চাইতো না। সোশাল মিডিয়াতেও বেশ কিছুকাল যাবৎ ভয়াবহ বিরোধিতা চলছিল, তাহের নাসিমের হত্যাকাণ্ডের ফলে বিরোধিতা আরো বৃদ্ধি পায়। এ প্রেক্ষিতেই এলাকায় এ বিরোধিতাপূর্ণ কর্মকাণ্ড চালানো হচ্ছিল যে, ঈদের পর কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে পূর্ণ প্রচারণা চালানো হবে, আর এলাকা থেকে তাদের উৎখাত করব। শহীদ মরহুম যেখানে বসবাস করছিলেন সে এলাকাটিই পরবর্তী টার্গেট ছিল। শহীদ মরহুম লক্ষণীয় গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন। ঘরে নিয়মিত বাজামা'ত নামাযের ব্যবস্থা ছিল, খিলাফতের প্রতি সীমাহীন ভালবাসা ছিল, এমটিএতে খুতবা শুনার বিশেষ ব্যবস্থা করতেন। জামা'তী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ ছাড়াও আতিথেয়তা, সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতি এবং গরীবদের সাহায্য তার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল। অভাবীদের বিনামূল্যে ঔষধ দিতেন, বংশের প্রত্যেক সদস্যের সাথে তার সহানুভূতিপূর্ণ সর্ম্পক

ছিল।ভাইদের পরিবারের সাথে ভালোবাসাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল আর ভাইদের সাথে এই ভালোবাসা আহমদীয়াত গ্রহণের পর আরো গভীর হয়। দাওয়াত ইলাল্লাহ্‌র কাজ তিনি অনেক আগ্রহের সাথে করতেন। এবছর তাহরীকে জাদীদের নতুন আর্থিক বছরের ঘোষণার সময় কমর্কর্তারা তার কাছে পরবর্তী বছরের ওয়াদার জন্য গেলে তিনি পকেটে হাত দেন আর যত টাকা ছিল তার পুরোটাই চাঁদা হিসেবে দিয়ে দেন। তার ছেলে ইয়াসের ২০১২ সালে অস্ট্রেলিয়ায় হিজরত করেছিলেন। ২০১৩ সালে শহীদ মরহুমও ছেলের কাছে অস্ট্রেলিয়ায় চলে যান। কিন্তু ২০১৪ সালে তিনি ছেলেকে নিয়ে পাকিস্তানে ফিরে আসেন এবং বলেন, আমার বাসনা হলো, নিজের দেশ ও এলাকায় থেকে গরীব মানুষের সেবা করব আর দেশের প্রতি ভালোবাসা আমাকে পাকিস্তানে থাকতে বাধ্য করেছে।

আমি যখন অস্ট্রেলিয়া সফরে গিয়েছিলাম তখন তিনি আমার সাথে সাক্ষাৎও করেছিলেন। দীর্ঘ দিন পেশাওয়ার জামা'তের সেক্রেটারী যিয়াফত হিসেবে কাজ করছিলেন। আহমদীরা স্বদেশ প্রেমের প্রেরণায় সব ধরনের কুরবানী করার জন্য প্রস্তুত থাকে। অপরদিকে যারা নামধারী দেশপ্রেমিক সেজে বসে আছে, তাদের আহমদীদের ওপর অপবাদ আরোপ ও তাদের ক্ষতি করা ছাড়া আর কোন কাজ নেই। যাহোক আহমদীয়াতের প্রকৃতিতে যা আছে তারা সে অনুযায়ীই কাজ করবে। তিনি দীর্ঘ দিন থেকে পেশাওয়ার জামা'তের সেক্রেটারী যিয়াফত ছিলেন আর আমৃত্যু তিনি এই দ্বায়িত্ব পালনের সৌভাগ্য লাভ করেছেন। গত রমজানে তিনি এ'তেকাফও করেছিলেন। তার এক ভাই ফারুক আহমদ সাহেব সড়ক দুর্ঘটনায় পূর্বেই মারা গিয়েছেন। দ্বিতীয় ভাইয়ের দোকান তার দোকানের কাছেই অবস্থিত। তিনিও সব সময় আতঙ্কগ্রস্ত থাকেন, বিভিন্ন হুমকি-ধমকি আসতে থাকে। শহীদ মরহুম শোকসন্তপ্ত পরিবারে স্ত্রী রশীদা মে'রাজ সাহেবা এবং তিন পুত্র যথাক্রমে ইয়াসের বয়স সাতাশ, মুসাব্বের আহমদ বয়স পঁচিশ ও জাযেব বয়স চৌদ্দ বছর আর আয়েশা নামে এম.বি.বি.এস-এর ছাত্রী এক কন্যা রেখে গেছেন। জাযেবকেও তার স্কুলে অনেক বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা এই ছেলে-মেয়েদেরও দুষ্কৃতকারীদের অনিষ্ট থেকে সুরক্ষিত রাখুন। আজকাল পাকিস্তানে বিরোধিতা অনেক বেড়ে গেছে। বরং সংসদ সদস্যরাও আমাদের প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে জনসাধারণকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করছে। অন্যায়ভাবে এমনসব লোকের অপকর্ম উপস্থাপন করা হয় যাদের সাথে জামা'তের কোন সম্পর্কই নেই আবার অপপ্রচার করা হয় যে, এরা আহমদী ছিল। অথচ জামা'তের সাথে এমন দুষ্কৃতকারীদের দূরতম কোন সম্পর্কও নেই। একইভাবে আজকাল যেনতেন লোকেরা সস্তা খ্যাতি লাভের উদ্দেশ্যে ইউটিউবে জামা'তের বিরুদ্ধে নিজেদের প্রোগ্রাম দিয়ে এবং মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে মনে করে যে, আমি অনেক পুণ্যের কাজ করছি। অথচ তাদের উদ্দেশ্য সৎ নয়, তারা কেবল নিজেদের সস্তা জনপ্রিয়তা চায়। আল্লাহ্ তা'লা এই দুষ্কৃতকারীদের দুষ্কৃতি তাদের প্রতিই ফিরিয়ে দিন। বর্তমান পরিস্থিতিতে বিশেষত পাকিস্তানের জামা'ত সমূহের এবং সব দেশের আহমদীদের অনেক বেশি দোয়া করা উচিত। **রাব্বি কুল্লু শায়ইন খাদেমুকা রাব্বি ফাহফাযনি ওয়ানসুরনি ওয়ারহামনি–** দোয়াটি অনেক বেশি পাঠ করুন। **আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফী নুহুরীহিম ওয়া নাঊযুবিকা মিন শুরুরিহিম–** দোয়াটিও অনেক বেশি পড়ুন। দরূদ শরীফ অধিক হারে পাঠ করুন। আল্লাহ্ তা'লা সকল আহমদীকে এই দুষ্কৃতকারীদের অনিষ্ট থেকে সুরক্ষিত রাখুন। এই শত্রুতা যতই বৃদ্ধি পাচ্ছে আমাদেরও তত বেশি আল্লাহ্ তা'লার দরবারে বিনত হওয়া উচিত।

শহীদ মরহুমের পুত্র ইয়াসের সাহেব লিখেন, আমার পিতা আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ওসীয়্যত করেছিলেন এবং সবসময় উৎসাহউদ্দীপনা নিয়ে নিষ্ঠার সাথে চাদা আদায় করতেন। এছাড়াও তিনি মানুষের জন্য চিন্তা করতেন এবং তাদের আর্থিক সাহায্য করতেন। আমার পিতা অনেক সাহসী ও নির্ভীক মানুষ ছিলেন। বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি সর্বদা নির্ভয়ে থাকতেন

এবং আল্লাহ্ তা'লার প্রতি পূর্ণ আস্থা রাখতেন। তিনি সবসময় এটিই বলতেন যে, আমি কোন বিরোধিতার পরোয়া করি না, আমার আল্লাহ্ আমার সাথে আছেন। তিনি খুবই সহজ-সরল, বিনয়ী এবং দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। সর্বদা প্রশস্ত হৃদয়ে মানুষের সাহায্য করতেন। খুবই তাকওয়াশীল ছিলেন এবং যিকরে এলাহীতে রত থাকতেন। আল্লাহ্ তা'লার সাথে তার দৃঢ় সম্পর্ক এবং খোদার প্রতি অগাধ আস্থা ছিল। নিয়মিত নামায ও তাহাজ্জুদ আদায়ে অভ্যস্ত ছিলেন। সকাল-সন্ধ্যা পবিত্র কুরআন পাঠ করতেন এবং নিজ সন্তানদেরও এর নসীহত করতেন। এবারের রমজানে তিনি এ'তেকাফেও বসেছিলেন। তিনি বলতেন, স্বপ্নে আমি এসব দুষ্কৃতকারী এবং মুনাফিকের ভয়াবহ পরিণতি দেখেছি। এছাড়া আস্থার সাথে বলতেন যে, আমাদের জন্য আল্লাহ তা'লা অনেক কিছু সংরক্ষণ করে রেখেছেন।

তিনি কিছুকাল অস্ট্রেলিয়াতে ছিলেন। অস্ট্রেলিয়ার আমীর সাহেব ও সেখানে বসবাসকারী অন্যান্য আহমদীরাও লিখেছেন, তিনি জামা'তের একজন নিবেদিতপ্রাণ সদস্য ও সক্রিয় কর্মী ছিলেন। খুবই মিশুক ও স্নেহশীল, একইসাথে অতিথিপরায়ণ এবং বিনয়ী মানুষ ছিলেন। অনেক নির্ভীক ও উদ্যমী আহমদী ছিলেন। খুবই স্বল্পভাষী ও নম্রভাষী ছিলেন। তিনি যখন (স্বদেশে) ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন তখন পাকিস্তানের আশঙ্কজনক পরিস্থিতি বিরাজমান থাকার কারণে তার বন্ধুবর্গ ও সন্তানরা তাকে যেতে বাধা দেয়, কিন্তু তিনি বলেন, জামা'তের জন্য যদি প্রাণ যায় তাহলে এর থেকে বড় সৌভাগ্য ও সম্মানের বিষয় আর কী হবে; এই বলে তিনি ফিরে যান। মেলবোর্ন জামা'তের যয়ীম আনসারুল্লাহ্ বলেন, শাহাদাতের দু'দিন পূর্বে তিনি আমাকে ফোন করে বলেন, বিরোধিতা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু আমি কিছুতেই ভয় পাওয়ার পাত্র নই।

দ্বিতীয় জানাযা মুরব্বি সিলসিলা স্নেহের আদীব আহমদ নাসের-এর, যিনি নারওয়ালের এধিপুর নিবাসী মুহাম্মদ নাসের আহমদ ডোগর সাহেবের পুত্র ছিলেন। তিনি গত ০৯ আগস্ট সংক্ষিপ্ত অসুস্থ থাকার পর ২৭ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তিনি জামেয়াতে ভর্তি হয়ে ২০১৭ সালের জুলাই মাসে জামেয়ার পড়াশোনা সম্পন্ন করেন। কর্মক্ষেত্রে যোগদান করেন এবং ইসলাহ ও ইরশাদ মকামীর অধীনে কর্মরত ছিলেন। তার বিয়ের কথাবার্তাও পাকাপাকি হয়ে গিয়েছিল আর কিছুদিনের মধ্যেই বিয়ে হবার কথা ছিল। ০৯ আগস্ট তারিখে তার জ্বর হয়, তা টাইফয়েডে রূপ নেয় এবং টাইফয়েড মারাত্মক রূপ ধারণ করে আর বোধশক্তি হারিয়ে যেতে থাকে, আর এর ফলে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। এর মাঝে তিনি কোন সতর্কতাও অবলম্বন করেন নি, নিজের কাজ অব্যাহত রাখেন এবং সফরও করতে থাকেন। যাহোক, দু'তিন দিনের সংক্ষিপ্ত অসুস্থতার পর এই জ্বরের কারণেই তিনি ইন্তেকাল করেন। তার পিতা নাসের ডোগর সাহেব লিখেন, ওয়াকফে জিন্দেগী হিসেবে আমার পুত্র আমাদের (বাবা-মা) উভয়ের জন্যই গর্বের কারণ ছিল। অত্যন্ত নেক ও পুণ্যবান পুত্র ছিল, নামায-রোযায় অভ্যস্ত, সাদাসিধে, নম্রভাষী, মুখে সবসময় হাসি লেগে থাকত।এসব গুণের কথা তার সাথে যোগাযোগ রক্ষাকারী মুরব্বী বন্ধুরাও লিখেছে। সবসময় হাসিখুশি থাকতেন। জামা'তের প্রতি ভালোবাসা ও সেবার গভীর প্রেরণা রাখতেন। সবারই প্রিয়ভাজন ছিলেন। চীনে জামা'ত, যেখানে তিনি সেবারত ছিলেন, সেখানে পদায়নের পূর্বেই 'বাইতুয্ যিক্র' এবং মুরব্বী কোয়ার্টার নির্মাণের জন্য অনেক উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে কাজ করেছেন। নিজের মাসিক ভাতা হতে অর্থ জমিয়ে (যৎসামান্য ভাতা হওয়া সত্ত্বেও) ত্রিশ হাজার রুপি মসজিদ নির্মাণের জন্য প্রেরণ করেন আর নির্মাণ কাজ আরম্ভ করার জন্য বার বার বলতেন। তার কাছে সর্বদা এটিই শোনা যেত যে, কাজ আরম্ভ করুন– আল্লাহ্ তা'লা বরকত দান করবেন। মরহুমের মা নাসেরা সাহেবা বলেন, আদীব আহমদের জন্মের দিনটি আমাদের কাছে আনন্দের ছিল একারণে যে আমরা তাকে খোদার পথে উৎসর্গ করে দিয়েছিলাম। চার

কন্যার পর খোদা তা'লা পুত্র দিয়েছিলেন এ কারণে আনন্দের সীমা ছিল না। সে বড় হয়ে মুরব্বী হবে এজন্যও আমরা আনন্দিত ছিলাম। আর দ্বিতীয় আনন্দের দিন আসে সেদিন যখন আমাদেরকে জামেয়ায় আমন্ত্রণ করে আদীবকে শাহেদ ডিগ্রী প্রদান করা হয়। অত্যন্ত পুণ্যবান ও অনুগত সন্তান ছিল। কর্মক্ষেত্র থেকে প্রতিদিন ফোন করে (আমরা) ঔষধ-পথ্য খেয়েছি কি-না তার সংবাদ নিত। মায়ের স্বাস্থ্যের খোঁজ-খবর নিত আর সবসময় শরীরের যত্ন নিতে বলতো। অত্যন্ত খোদাপ্রেমী মানুষ ছিল। কৃষিজীবি পরিবারের সন্তান ছিল, তাই গমের মৌসুম আসলেই তার মা'কে বলতো, গম বেশি করে (জমা) রাখুন, কেননা অনেক অভাবীও আসে, দরিদ্রদেরও সাহায্য করতে হয় এবং তাদেরকেও দিতে হয়।

এধীপুর নামক স্থানে চীনে জামা'ত অবস্থিত, যেখানে এক কক্ষবিশিষ্ট আবাসন ছিল। সব জিনিসপত্র না থাকা সত্ত্বেও সানন্দে তিনি সেখানে দায়িত্ব পালন করেন। ফয়সালাবাদ জেলার মুরব্বী জাভেদ লাঙ্গা সাহেব বলেন, মরহুম ওয়াক্‌ফ এর প্রকৃত মর্ম অনুধাবন করে জীবন যাপনকারী ছিলেন। কঠোর পরিশ্রম করে তিনি জামা'তের কাজ করেন। জামা'তের সদস্যদের উত্তম তরবিয়তের পাশাপাশি তিনি কর্মকর্তাদেরও সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছেন। তরবিয়তের লক্ষ্যে তিনি খলীফাদের বিভিন্ন বক্তব্যের অংশবিশেষ জামা'তের সদস্যদের বিশেষভাবে শোনাতেন। কারো মাঝে কোন ত্রুটি দেখলে তার আত্মসম্মানের প্রতি দৃষ্টি রেখে পৃথকভাবে তাকে বুঝাতেন। সবার সহযোগিতা করতেন। খিলাফতের প্রতি ভালোবাসা, জামা'তের ব্যবস্থাপনার প্রতি আনুগত্য, মেলামেশা, সদাচার, নম্রতা ও বিনয় ছিল মরহুমের উল্লেখযোগ্য গুণাবলী। খুবই মার্জিত এবং সর্বাবস্থায় খোদার ইচ্ছায় সন্তুষ্ট ছিলেন।
আল্লাহ্ তা'লা তার পিতামাতাকেও মানসিক প্রশান্তি ও ধৈর্য দান করুন। তাদেরকে বিয়োগ বেদনা সহ্য করার তৌফিক দিন আর তার বোনদেরও মনোবল দান করুন। তিনি মরহুমের প্রতি ক্ষমা ও দয়াসুলভ আচরণ করুন এবং (তার) পদমর্যাদা উন্নীত করুন।

পরবর্তী যার জানাযা পড়াব এবং স্মৃতিচারণ করব তিনি হলেন, শেখ মুহাম্মদ হোসেন সাহেবের পুত্র শ্রদ্ধেয় হামীদ আহমদ শেখ সাহেব। গত ১২ আগস্ট তারিখে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ৮৫ বছর বয়সে তার ইন্তেকাল হয়, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত শেখ নূর আহমদ সাহেবের পৌত্র ছিলেন। মরহুমের পিতা শ্রদ্ধেয় শেখ মুহাম্মদ হোসেন সাহেব চিনিউট জামা'তের আমীর হিসেবে দায়িত্ব পালনের সুযোগ পেয়েছেন। বয়আত গ্রহণের পর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) হযরত শেখ নূর আহমদ সাহেবকে তার দুই পুত্রকে পড়াশোনার উদ্দেশ্যে কাদিয়ান প্রেরণের নির্দেশ দিয়েছিলেন। অতএব, শ্রদ্ধেয় হামীদ আহমদ শেখ সাহেবের পিতা শেখ মুহাম্মদ হোসেন সাহেব কাদিয়ান থেকে মাধ্যমিক পাশ করেন। সেখানে তার হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর সহপাঠী হওয়ারও সৌভাগ্য হয়। হামীদ আহমদ শেখ সাহেবের নানা ছিলেন হযরত মৌলভী আব্দুল কাদের সাহেব লুধিয়ানভী, যিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ৩১৩জন সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কপুরথলা নিবাসী হযরত মুন্সী জাফর আহমদ সাহেবের পৌত্রীর সাথে হামীদ শেখ সাহেবের বিয়ে হয়। মরহুম হামীদ শেখ সাহেব চার্টার্ড আর্কিটেক্ট ছিলেন। ১৯৭৩ সালে তিনি লন্ডনে তার শিক্ষা সম্পন্ন করেন। আমাদের রুটি প্ল্যান্টের সাবেক ইনচার্জ উইম্বলডনের রশীদ আহমদ সাহেবের ভাই ছিলেন তিনি। মরহুমের শোকসন্তপ্ত পরিবারে দুই পুত্র ও এক কন্যা রয়েছে। মরহুমের এক ছেলে আব্দুর রাজ্জাক শেখ সাহেব আমাদের স্থপতি-সংগঠন IAAAE- ইউকে'র সহ-সভাপতি। আব্দুর রাজ্জাক শেখ সাহেব লিখেন, আমার পিতা একজন স্নেহশীল পুত্র, স্বামী, পিতা ও দাদা ছিলেন। গোটা পরিবারের সদস্যরা তাকে ভালোবাসতো। তিনি আহমদীয়া জামাতের খুবই পুণ্যবান ও নিষ্ঠাবান সদস্য ছিলেন। কখনো জামাত-সেবার কোন সুযোগ হাতছাড়া হতে দিতেন না। যুগ-খলীফাকে (নিয়মিত) চিঠি

লিখতেন আর নিজ সন্তানদেরও চিঠি লেখার জন্য অনুপ্রাণিত করতেন। সব জায়গায় সন্তানদেরকে স্থানীয় জামা'তের সাথে যোগাযোগ রক্ষার জন্য উপদেশ দিতেন আর এ সম্পর্কে বারংবার নসীহত করতেন। বাজামা'ত নামাযের বিষয়ে যত্নবান ছিলেন আর সন্তানদেরও এদিকে মনোযোগ আকর্ষণ করতেন। জামা'তের বিভিন্ন আর্থিক তাহরীকে উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে অংশ নিতেন, আর মৃত্যুর দু'সপ্তাহ পূর্বে একান্ত গুরুত্বসহকারে নিজের সকল বকেয়া চাঁদা পরিশোধ করেন। তিনি নাইজেরিয়াতেও ছিলেন। সেখানেও নিজ পেশার সুবাদে বিভিন্ন মসজিদ ও মিশন হাউসের জমির সজ্জা ও শোভাবর্ধনের কাজে সহযোগিতা করেছেন। নাইজেরিয়া ত্যাগ করার সময় নিজের ব্যবহারের গাড়িটিও সেখানকার জামা'তকে উপহার স্বরূপ দিয়ে আসেন। পাকিস্তানে অবস্থানকালেও ইসলামাবাদে IAAAE-এর সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন। মোটকথা বিভিন্ন পদে থেকে তিনি সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের সন্তানদেরও তার পুণ্যসমূহ ধরে রাখার তৌফিক দিন। মরহুমের প্রতি দয়া ও ক্ষমাসুলভ আচরণ করুন আর তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন। জুমুআর নামাযের পর আমি এই তিনজনের (গায়েবানা) জানাযা পড়াব, ইনশাআল্লাহ্।

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কেরে তত্ত্বাবধানে অনূদিত)